দৈনিক ইনকিলাব

78

তারিখ 25 NOV 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে অপসারণের চিন্তা-ভাবনা চলছে

॥ মাহবুবুল বাসেত ॥

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জনাব আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে খুব শিগ্‌গিরই অপসারণ বা চাকরিচ্যুত করা হবে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ইতিমধ্যেই চিন্তা-ভাবনা শেষে প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর চার বছরের জন্যে তাকে ভিসি পদে নিয়োগদান করেছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে এবং জনাব আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনের 'অনাকাঙ্ক্ষিত' মনোভাবের প্রেক্ষিতে চ্যান্সেলর এখন ভিসির পদ থেকে তাকে অপসারণের এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন বলে দায়িত্বশীল সূত্রে প্রকাশ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের আইনে ভিসিকে অপসারণ বা চাকরিচ্যুত করার কোন

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভিস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিধান না থাকায় ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট-এর ১৬ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এ চাকরিচ্যুতি ঘটানো হতে পারে। তবে ভিসির পদ থেকে চাকরিচ্যুতির পরও জনাব আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত শিক্ষক হিসাবে তার পূর্বের পদে বহাল রাখা হবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি জনাব আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে ১৯৮৮ সালের ২৩ মে ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। এরপর ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে তিনি স্থায়ীভাবে ভিসি হন। গত প্রায় এক বছর যাবত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের কাছে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি ও অদক্ষ প্রশাসক হিসাবে বিবেচিত হন। একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনও তার সম্পর্কে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার বিতর্কিত ভূমিকা ও অদক্ষতার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন এখন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে তার অপসারণের দাবীতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত ধর্মঘট চলছে, কোন ক্লাস হচ্ছে না। প্রশাসনিক কাজ-কর্মেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মধ্যেও গ্রুপিং চরম আকার ধারণ করেছে। তার অদক্ষতা ও বিতর্কিত ভূমিকার কারণে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই তার পক্ষ ও বিপক্ষের ছাত্র ও শিক্ষকদের গ্রুপগুলোর মধ্যে কয়েক দফা অপ্রীতিকর ঘটনা ও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বহু ছাত্র হতাহতও হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ভিসিকে কেন্দ্র করে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা হরতাল, ধর্মঘট ও ছাত্র সংঘর্ষসহ নানা কারণে দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

তাই সরকার তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরকে বিষয়টি দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। সরকার বিশেষ করে চ্যান্সেলর আশা করেছিলেন, জনাব আলমগীর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিবেকের তাড়নায় জাগ্রত হবেন। কিন্তু সে ধরনের কোন লক্ষণ না দেখায় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুযায়ী ভিসিকে অপসারণ বা চাকরিচ্যুত করার কোন বিধান না থাকায় সরকার তথা চ্যান্সেলর বিলম্বে হলেও এখন দেশে প্রচলিত ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের ১৬ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন বলে একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। আগামী ৭ কিংবা ১০ দিনের মধ্যেই চ্যান্সেলরের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি আদেশ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৭৩-এর ১২ ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট চার বছরের জন্যে ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে তিনজনের একটি প্যানেল মনোনীত করে। আর চ্যান্সেলর ঐ তিনজনের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে ভিসি পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এ এ্যাক্টে চাকরিচ্যুতির বা অপসারণের কোন বিধান নেই। তবে এ্যাক্টের ১০ ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী ভিসি একজন কর্মকর্তা বিধায় ৫৫ ধারা অনুযায়ী কতিপয় বিষয় বিশেষ করে নৈতিক স্খলন, অসদাচরণ ও অদক্ষতার কারণে চাকরিচ্যুত করা যায়। কিন্তু তার জন্যেও তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

তাই এমতাবস্থায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তেজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর মানসিকতা নিয়ে দেশে বিদ্যমান আইন জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট ১৮৯৭-এর আশ্রয় নেয়া হতে পারে। এ এ্যাক্টের ১৬ ধারাকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী হিসাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৬ ধারার মূল কথা হচ্ছেঃ "SECTION 16—POWER TO APPOINT TO INCLUDE POWER TO SUSPEND OR DISMISS." অর্থাৎ যার নিয়োগদানের ক্ষমতা আছে বা যিনি নিয়োগদান করবেন তার বরখাস্ত করার বা চাকরিচ্যুত করারও ক্ষমতা আছে। এ ব্যাপারে প্রায় অনুরূপ একটি মামলায় পঞ্চাশের দশকের কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়ও রয়েছে।

উল্লেখ্য, সরকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দুঃখজনক ঘটনা তদন্তের উদ্দেশ্যে চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারী হাইকোর্টের বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরীর নেতৃত্বে এক সদস্যের একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশনের দায়িত্ব ছিল (ক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বরের এবং তৎপরবর্তী দিনসমূহে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনাবলী কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটেছে তা নির্ণয় করা, (খ) সংশ্লিষ্ট সময়ে হামলা, সন্ত্রাস ও হত্যার প্রচেষ্টার সাথে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং (গ) ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থার সুপারিশ করা।

কমিশন ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী ও সরকারী কর্মচারীসহ বিভিন্ন পেশার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ ও ঘটনার দীর্ঘ তদন্ত শেষে তিন শত চার পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। প্রতিবেদক এ রিপোর্টটি বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেছেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের এ রিপোর্টের ২শ' ৯১ পৃষ্ঠায় ভিসি প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে দায়ী করে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অঘটন তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে এবং তাকে ঐ পদে রেখে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আনা যাবে না।

এ রিপোর্টের ২শ' ৭২ পৃষ্ঠায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনার জন্যে ভিসিকে দায়ী করে বলা হয়েছেঃ ঘটনাবলী ও প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন একজন অদক্ষ প্রশাসক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি চরম অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমস্যা সমাধানে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তিনি সমস্যাকে অযথা রাজনীতিকরণের প্রয়াস নেন। তিনি বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা না করে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কাছে এর সমাধান চেয়েছেন।

রিপোর্টের ২শ' ৮৪ পৃষ্ঠায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীর জন্যে ইসলামী ছাত্র শিবিরকেও পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয়। এর ২শ' ৮৪ পৃষ্ঠায় আরো বলা হয় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিরপেক্ষ নন। তাদের নিজস্ব গ্রুপগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোকে হয় সমর্থন করছে নয়তো বিরোধিতা করছে। এতে শিক্ষকদের দলাদলির কথা উল্লেখ করে বলা হয়, শিক্ষকদের কোন অংশ ভিসিকে সমর্থন করছেন। আবার অপর অংশ তার বিরোধিতা করছেন। এ ক্ষেত্রে উভয় গ্রুপই ছাত্রদেরকে ব্যবহার করছেন।

রিপোর্টের ২শ' ৯৯ ও ৩শ' পৃষ্ঠায় আরো বলা হয় যে, ভিসি প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তার ভূমিকার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে কমিশন তার রিপোর্টে বলেছেন, যখন তার অপসারণ অথবা পদত্যাগ প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে উঠে এবং যখন তিনি পুরোপুরি সচেতন যে, ঐ আন্দোলনের পেছনে একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন সক্রিয় তখন তার উচিত ছিল এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা ও সজাগ থাকা। সদা-সতর্ক থাকার পরিবর্তে তিনি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দিয়েছেন।

বিচার বিভাগীয় এ তদন্ত কমিশন তার রিপোর্টের ৩শ' ১ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ আমি ভেবে অবাক হই যে, কেমন করে উচ্চ শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা এতটা নীচে নামতে পারেন? তারা কিভাবে ছাত্রদেরকে উস্কে দেন এবং ছাত্রদের মিছিলে অংশ নেন? অভিভাবকরা ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান উচ্চ শিক্ষার জন্যে। শিক্ষকদের দায়িত্ব কেবল ছাত্রদেরকে সঠিক শিক্ষা দেয়া। তাদের মাস্তান বা উচ্ছৃংখল বানানো নয়। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যা দেখলাম তাতে রীতিমত ভীত।

পরিশেষে রিপোর্টে ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কিত ব্যাপক অভিযোগের ব্যাপারে বলা হয়, কমিশনের কাছে পেশকৃত এসব বিষয় কমিশনের এখতিয়ারে পড়ে না। রিপোর্টে এসব বিষয় তদন্তের জন্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের জন্যে চ্যান্সেলরের প্রতি আহবান জানিয়ে বলা হয়, ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এটা অধিকতর সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জনাব আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনের অপসারণ বা চাকরিচ্যুতির বিরুদ্ধে যদি জনাব আলমগীর সিরাজউদ্দিন আইনগত ব্যবস্থা নেন তাহলে তা মোকাবেলা করার জন্যে কি ব্যবস্থা আছে—এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে সরকারের একটি উর্ধ্বতন সূত্র বলেছেন—কেন? বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টই যথেষ্ট নয় কি?